সত্যান্বেষী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

সত্যান্বেষী ০১ 2
সত্যান্বেষী ০২ 10
সত্যান্বেষী ০৩ 17
সত্যান্বেষী ০৪ 25
সত্যান্বেষী ০৫ 34
সত্যান্বেষী ০৬ 42

সত্যান্বেষী ০১

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সন তেরশ' একত্রিশ সালে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি। পয়সার বিশেষ টানাটানি ছিল না, পিতৃদেব ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সুদে আমার একক জীবনের খরচা কলিকাতার মেসে থাকিয়া বেশ ভদ্রভাবেই চলিয়া যাইত। তাই স্থির করিয়াছিলাম, কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিব। প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় মনে হইয়াছিল, একান্তভাবে বাগদেবীর আরাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অচিরাৎ যুগান্তর আনিয়া ফেলিব। এই সময়টাতে বাঙালীর সন্তান অনেক ভাল স্বপ্ন দেখে,–যদিও সে-স্বপন ভাঙিতেও বেশী বিলম্ব হয় না।

কিন্তু ও কথা থাক। ব্যোমকেশের সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল এখন তাহাই বলি।

যাঁহারা কলিকাতা শহরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো জানেন না যে এই শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার এক দিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্য দিকে খোলার বস্তি এবং তৃতীয় দিকে তির্যক্‌ চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্যস্থলে যে 'ব'-দ্বীপটি সৃষ্টি হইয়াছে, দিনের কর্ম-কোলাহলে তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে ইহার কোনও অসাধারণত্ব বা অস্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই এই পল্লীতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। আটটা বাজিতে না বাজিতেই দোকানপাট সমস্ত বন্ধ হইয়া পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়; একেবল দূরে দূরে দু'একটা পান বিড়ির দোকান খোলা থাকে মাত্র। সে সময় যাহারা এ অঞ্চলে চলাফেরা করিতে আরম্ভ

করে, তাহারা অধিকাংশই নিঃশব্দে ছায়ামূর্তির মত সঞ্চরণ করে বং যদি কোনও অজ্ঞ পথিক অতর্কিতে এ পথে আসিয়া পড়ে, সে-ও দ্রুতপদে যেন সন্ত্রস্তভাবে ইহার এলাকা অতিক্রম করিয়া যায়।

আমি কি করিয়া এই পাড়াতে আসিয়া এক মেসের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা বিশদ করিয়া লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনের বেলা পাড়াটা দেখিয়া মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হয় নাই এবং মেসের দ্বিতলে একটী বেশ বড় হাওয়াদার ঘর খুব সস্তায় পাইয়া বাক্যব্যয় না করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলাম। পরে যখন জানিতে পারিলাম যে, এই পাড়ায় মাসের মধ্যে দুই তিনটা মৃতদেহ ক্ষতিবিক্ষত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং নানা কারণে সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া পুলিস-রেড্ হইয়া থাকে, তখন কিন্তু বাসাটার উপর এমন মমতা জন্মিয়া গিয়াছে সে, আবার তল্পিতল্পা তুলিয়া নূতন বাসায় উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নাই। বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর আমি নিজের লেখাপড়ার কাজেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম, বাড়ির বাহির হইবার কোনও উপলক্ষ ছিল না; তাই ব্যক্তিগত ভাবে বিপদে পড়িবার আশঙ্কা কখনও হয় নাই।

আমাদের বাসার উপরতলায় সর্বসুদ্ধ পাঁচটি ঘর ছিল, প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই চাকরীজীবী এবং বয়স্ক; শনিবারে শনিবারে বাড়ী যাইতেন, আবার সোমবারে ফিরিয়া অফিস যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। ইঁহারা অনেকদিন হইতে এই মেসে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি একজন কাজ হইতে অবসর লয়া বাড়ী চলিয়া যাওয়াতে তাঁহারই শূন্য ঘরটা আমি দখল করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর তাসের বা পাশার আড্ডা বসিত–সেই সময় মেসের অধিবাসীদের কণ্ঠস্বর ও উত্তেজনা কিছু উদ্রভাব ধারণ করিত। অশ্বিনীবাবু পাকা খেলোয়াড় ছিলেন,–তাঁহার স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন

ঘনশ্যামবাবু। ঘনশ্যামবাবু হারিয়ে গেলে চেঁচামেচি করিতেন। তারপর ঠিক নয়টার সময় বামিন ঠাকুর আসিয়া জানাইত যে আহার প্রস্তুত; তখন আবার ইঁহারা শান্তভাবে উঠিয়া আহার সমাধা করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িতেন। এইরূপ বিরুদ্ধঘাত শানিতে মেসের বৈচিত্রহীন দিনগুলি কাটিতেছিল; আমিও আসিয়া নির্বিবাদে এই প্রশান্ত জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।

বাসার নীচের তলার ঘরগুলি লইয়া বাড়িওয়ালা নিযে থাকিতেন। ইনি একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার–নাম অনুকুলবাবু। বেশ সরল সদালাপী লোক। বোধ হয় বিবাহ করেন নাই, কারণ, বাড়িতে স্ত্রী পরিবার কেহ ছিল না। তিনি মেসের খাওয়া-দাওয়া ও ভাড়াটেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন পরিপাটীভাবে তিনি সমস্ত কাজ করিতেন যে, কোন দিক্ দিয়া কাহারও অনুযোগ করিবার অবকাশ থাকিত না, মাসের গোড়ায় বাড়িভাড়া ও খোরাকি বাবদ পঁচিশ টাকা তাঁহার হাতে ফেলিয়া দিয়া সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

পাড়ার দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তারের বেশ পসার ছিল। সকালে ও বিকালে তাঁহার বসিবার ঘরে রোগীর ভিড় লাগিয়া থাকিত। তিনি ঘরে বসিয়া সামান্য মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। রোগীর বাড়িতে বোড় একটা যাইতেন না, গেলেও ভিজিট লইতেন না। এই জন্য পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত খাতির ও শ্রদ্ধা করিত। আমিও অল্পকালের মধ্যে তাঁহার ভারি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা দশটার মধ্যে মেসের অন্যান্য সকলে অফিসে চলিয়া যাইত, বাসায় আমরা দুইজনে পড়িয়া থাকিতাম। স্নানাহার প্রায় একসঙ্গেই হইত, তারপর দুপুরবেলাটাও গল্প-গুজবে সংবাদপত্রের আলোচনায় কাটিয়া যাইত, ডাক্তার অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ লোক হইলেও ভারি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। বয়স বছর চল্লিশের ভিতরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধিও

তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় বোধ হইত। বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া বলিতেন–"আর তো কোনও কাজ নেই, ঘরে বসে বসে কেবল বই পড়ি। আমার যা কিছু সংগ্রহ সব বই থেকে।"

এই বাসায় মাস দুই কাটিয়া যাইবার পর একদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় আমি ডাক্তারবাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার খবরের কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিলাম। অশ্বিনীবাবু পান চিবাইতে চিবাইতে অফিস চলিয়া গেলেন; তারপর ঘনশ্যামবাবু বাহির হইলেন, দাঁতের ব্যথার জন্য এক পুরিয়ে ঔষধ ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে লইয়া তিনিও অফিস যাত্রা করিলেন। বাকি দুইজনও একে একে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দিনের জন্য বাসা খালি হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবুর কাছে তখনও দু'একজন রোগী ছিল, তাহারা ঔষধ লইয়া একে একে বিদায় হইলে পর তিনি চশমাটা কপালে তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"কাগজে কিছু খবর আছে না কি?

"কাল বৈকালে আমাদের পাড়ায় খানাতল্লাসী হয়ে গেছে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন–"সে তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় হল?"

"কাছেই–ছত্রিশ নম্বরে। শেখ আবদুল গফুর বলে একটা লোকের বাড়িতে।"

ডাক্তার বলিলেন–"আরে লোকটাকে যে আমি চিনি, প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ নিতে আসে।–কি জন্যে খানাতল্লাসী হয়েছে, কিছু লিখেছে?"

"কোকেন। এই পড়ুন না!" বলিয়া আমি 'দৈনিক কালকেতু' তাঁহার দিকে আগাইয়া দিলাম।

ডাক্তার চশমা-জোড়া পুনশ্চ নাসিকার উপর নামাইয়া পড়িতে লাগিলেন।–

"গতকল্য–অঞ্চলে ছত্রিশ নং–স্ট্রীটে শেখ আবদুল গফুর নামে জনৈক চর্ম-ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিসের খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনও বে-আইনী মাল পাওয়া যায় নাই। পুলিসের অনুমান, এই অঞ্চলে কোথাও একটি কোকেনের গুপ্ত আড়ত আছে, সেখান হইতে সর্বত্র কোকেন সরবরাহ হয়। এক দল চতুর অপরাধী পুলিসের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন যাবৎ এই আইন-বিহর্গিত ব্যবসা চালাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অপরাধীদের নেতা কে এবং ইহাদের গুপ্ত ভাণ্ডার কোথায়, তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন–"কথাটা ঠিক। আমারও সন্দেহ হয় কাছে-পিঠে কোথাও কোকেনের একটা মস্ত আড্ডা আছে। দু'একবার তার ইশারা আমি পেয়েছি,– জানেন তো নানা রকম লোক ওষুধ নিতে আমার কাছে আসে। আর যাই করুক, যে কোকেনখোর, সে ডাক্তারের কাছে কখনও আত্মগোপন করতে পারে না।–কিন্তু ঐ আবদুল গফুর লোকটাকে তো আমার কোকেনখোর বলে মনে হয় না। বরং সে যে পাকা আফিংখোর এ কথা জোর করে বলতে পারি। সে নিজেও সে কথা গোপন করে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–"আচ্ছা, অনুকূলবাবু, এ পাড়ায় যে এত খুন হয়, তার কারণ কি?"

ডাক্তার বলিলেন–"তার তো খুব সহজ হিসাব রয়েছে। যারা গোপনে আইন ভঙ্গ করে একটা বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের সর্বদাই ভয়–পাছে ধরা পড়ে। সুতরাং দৈবক্রমে যদি কেউ তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে যায়, তখন তাকে খুন করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ভেবে দেখুন, আমি যদি কোকেনের ব্যবসা করি আ আপনি যদি দৈবাৎ সে কথা জানতে পেরে যান, তাহলে আপনাকে বাঁচতে দেওয়ার আমার পক্ষে আর নিরাপদ হবে কি? আপনি যদি কথাটি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, তাহলে আমি তো জেনে

যাবই, সঙ্গে সঙ্গে এতবড় একটা ব্যবসা ভেস্তে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আমি তা হতে পারি?” বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম–“আপনি অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বেশ অনুশীলন করেছেন দেখছি!”

“হ্যাঁ। ওদিকে আমার খুব ঝোঁক আছে!” বলিয়া আড়মোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমিও উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রঙ ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,–মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে। কিন্তু বোধ হয়, সম্প্রতি কোনও কষ্টে পড়িয়াছে; কারণ, বেশভূষার কোনও যত্ন নাই, চুলগুলি অবিন্যস্ত, গায়ের কামিজটা ময়লা, এমন কি পায়ের জুতাজোড়াও কালির অভাবে রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে। মুখে একটা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব। আমার দিক হইতে অনুকূল্বাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল–“শুনলুম এটা একটা মেস–জায়গা খালি আছে কি?”

ঈষৎ বিস্ময়ে আমরা দু’জনেই তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, অনুকূলবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন–“না। মশায়ের কি করা হয়?”

লোকটি ক্লান্তভাবে রোগীর বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল–“উপস্থিত চাকরির জন্য দরখাস্ত দেওয়া আর মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা খোঁজা হয়। কিন্তু এই হতভাগা শহরে একটা মেসও কি খালি পাবার যো নেই–সব কানায় কানায় ভর্তি হয়ে আছে।”

সহানুভূতির স্বরে অনুকূলবাবু বলিলেন–“সীজ্‌নের মাঝখানে মেসে-বাসায় জায়গা পাওয়া বড় মুসকিল। মশায়ের নামটি কি?”

"অতুলচন্দ্র মিত্র। কলকাতায় এসে পর্যন্ত চাকরির সন্ধানে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেশে ঘটি-বাটি বিক্রি করে যে-ক'টা টাকা এনেছিলুম, তাও প্রায় শেষ হয়ে এল—গুটি পঁচিশ-ত্রিশ বাকী আছে। কিন্তু দু'বেলা হোটেলে খেলে সেও আর কদ্দিন বলুন? তাই একটা ভদ্রলোকের মেস খুঁজছি—বেশি দিন নয়, মাসখানেকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে—এই ক'টা দিনের জন্য দু'বেলা দুটো শাকভাত আর একটু জায়গা পেলেই আর আমার কিছু দরকার নেই।"

অনুকূলবাবু বলিলেন—"বড় দুঃখিত হলাম অতুলবাবু, কিন্তু আমার এখানে সব ঘরই ভর্তি।"

অতুল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তবে আর উপায় কি বলুন—আবার বেরুই। দেখি যদি ওড়িয়াদের আড্ডায় একটু জায়গা পাই।—আর তো কিছু নয়, ভয় হয়, রাত্তিরে ঘুমুলে হয়তো টাকাগুলো চুরি করে নেবে।—এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন?"

ডাক্তার জল আনিতে গেলেন। লোকটির অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দয়া হইল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম—"আমার ঘরটা বেশ বড় আছে—দু'জনে থাকলে অসুবিধা হবে না। তা—আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

অতুল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"আপত্তি? বলে কি মশায়—স্বর্গ হাতে পাব।" তাড়াতাড়ি ট্যাঁক হইতে কতকগুলো নোট ও টাকা বাহির করিয়া বলিল—"কত দিতে হবে? টাকাটা আগাম নিয়ে নিলে ভাল হত না? আমার কাছে আবার—"

তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম—"থাক্, টাকা পরে দেবেন অখন—তাড়াতাড়ি কিছু নেই—" ডাক্তারবাবু জল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে বলিলাম—"ইনি সঙ্কটে পড়েছেন তাই আপাতত আমার ঘরেই থাকুন—আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

অতুল কৃতজ্ঞতাগদ্‌গদ স্বরে বলিল–“আমার ওপর ভারি দয়া করেছেন ইনি! কিন্তু বেশি দিন আমি কষ্ট দেব না–ইতিমধ্যে যদি অন্য কোথাও জায়গা পেয়ে যাই, তাহলে সেখানেই উঠে যাব।” বলিয়া জলপানান্তে গেলাসটা নামাইয়া রাখিল।

ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন–“আপনার ঘরে? তা–বেশ। আপনার যখন অমত নেই, তখন আমি কি বলব? আপনার সুবিধাও হবে–ঘরভাড়াটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে–”

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম–“সে জন্য নয়–উনি বিপদে পড়েছেন–”

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন–“সে তো বটেই। –তা আপনি আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসুন গে, অতুলবাবু। এইখানেই আপাতত থাকুন।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। জিনিসপত্র সামান্যই–একটা বিছানা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ। এক হোটেলের দারোয়ানের কাছে রেখে এসেছি–এখনই নিয়ে আসছি।”

আমি বলিলাম–“হ্যাঁ–স্নানাহার এখানেই করবেন।”

“তাহলে তো ভালই হয়।”–কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অতুল বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে আমরা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। অনুকূলবাবু অন্যমনস্কভাবে কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–“কি ভাবছেন ডাক্তারবাবু?”

ডাক্তার চমক ভাঙিয়া বলিলেন–“কিছু না। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, আপনি ভালই করেছেন। তবে কি জানেন–‘অজ্ঞাতকুলশীলস্য’–শাস্ত্রের একটা বচন আছে–। যাক্, আশা করি, কোনও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে না।” বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

সত্যান্বেষী ০২

অতুল মিত্র আমার ঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। অনুকূলবাবুর কাছেও একটা বাড়তি তক্তপোষ ছিল, তিনি সেখানা অতুলের ব্যবহারের জন্য উপরে পাঠাইয়া দিলেন।

অতুল দিনের বেলায় বড় একটা বাসায় থাকিত না। সকালে উঠিয়া চাকরির সন্ধানে বাহির হইয়া যাইত, বেলা দশটা এগারোটার সময় ফিরিত; আবার স্নানাহারের পর বাহির হইত। কিন্তু যতটুকু সময় সে বাসায় থাকিত, তাহারই মধ্যে বাসার সকলের সঙ্গে বেশ সম্প্রীতি জমাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খেলার মজলিসে তাহার ডাক পড়িত। কিন্তু সে তাস-পাশা খেলিতে জানিত না, তাই কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প-গুজব করিত। আমার সঙ্গেও তাহার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল। দু’জনের একই বয়স, তার উপর একই ঘরে ওঠা-বসা; সুতরাং আমাদের সম্বোধন ‘আপনি’ হইতে ‘তুমি’তে নামিতে বেশি বিলম্ব হয় নাই।

অতুল আসিবার পর হপ্তাখানেক বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। তারপর মেসে নানা রকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পর অতুল ও আমি অনুকূলবাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। রোগীর ভিড় কমিয়া গিয়াছিল; দু’একজন মাঝে মাঝে আসিয়া রোগের বিবরণ বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল, অনুকূলবাবু আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঔষধ দিতেছিলেন ও হাত-বাক্সে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছিলেন। গতরাত্রিতে প্রায় আমাদের বাসার সম্মুখে একটা খুন হইয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রাস্তার উপর লাস আবিষ্কৃত হইয়া একটু উত্তেজনার কারণ এই যে, লাস দেখিয়া লোকটাকে দরিদ্র শ্রেণীর ভাটিয়া বলিয়া মনে হইলেও তাহার কোমরের গেঁজের ভিতর হইতে একশ’ টাকার দশকেতা নোট পাওয়া গিয়াছিল।

ডাক্তার বলিতেছিলেন–"এ কোকেন ছাড়া আর কিছু নয়। ভেবে দেখুন, টাকার লোভে যদি খুন করত, তাহলে ওর কোমলে হাজার টাকার নোত পাওয়া যেতো না–আমার মনে হয়, লোকটা কোকেনের খরিদ্দার ছিল; কোকেন কিনতে এসে কোকেন-ব্যবসায়ীরদের সম্বন্ধে কোনও মারাত্মক গুপ্তকথা জানতে পারে। হয়তো তাদের পুলিসের ভয় দেখায়ম blackmail করবার চেষ্টা করে। তার পরেই ব্যস,–খতম।"

অতুল হাসিয়া বলিল–"কে জানে মশায়, আমার তো ভারি ভয় করছে। আপনার এ পাড়ায় আছে কি করে? আমি যদি আগে জানতুম, তাহলে–"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন–"তাহলে ওড়িয়াদের আড্ডাতেই যেতেন? আমাদের কিন্তু ভয় করে না। আমি তো দশ-বারো বছর এ পাড়ায় আছি, কিন্তু কারুর কথায় থাকি না বলে কখনও হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি।"

অতুল ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল–"ডাক্তারবাবু, আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন–না?"

হঠাৎ পিছনে খুট করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, আমাদের মেসের অশ্বিনীবাবু দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছেন। তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিলাম–"কি হয়েছে অশ্বিনীবাবু? আপনি এ সময় নীচে যে?"

অশ্বিনীবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন–"না, কিছু না–অমনি। এক পয়সার বিড়ি কিনতে–" বলিতে বলিতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিলাম। পৌঢ় গম্ভীর-প্রকৃতি অশ্বিনীবাবুকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম–তিনি হঠাৎ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া আড়ি পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিলেন কেন?

রাত্রিতে আহারে বসিয়া জানিতে পারিলাম অশ্বিনীবাবু পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছেন। আহারান্তে অভ্যাসমত একটু চুরুট শেষ করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, অতুল মেঝের উপর একটা বালিশ ফেলিয়া শুইয়া আছে। একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ, এমন কিছু গরম পড়ে নাই যে মেঝেয় শোয়া প্রয়োজন হইতে পারে। ঘর অন্ধকার ছিল, অতুলও কোনও সাড়া দিল না–তাই ভাবিলাম, সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমার তখনও ঘুমের কোনও আগিদ ছিল না, কিন্তু আলো জ্বালিয়া পড়িতে বা লিখিতে বসিলে হয়তো অতুলের ঘুম ভাঙিয়া যাইবে, তাই খালি পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে বেড়াইবার পর হঠাৎ মনে হইল, যাই অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তাঁহার কোন অসুখ-বিসুখ করিয়াছে কি না। আমার দু'খানা ঘর পরেই অশ্বিনীবাবুর ঘর; গিয়া দেখিলাম, তাঁহার দরজা খোলা, বাহির হইতে ডাক দিয়া সাড়া পাওয়া গেল না। তখন কৌতুহলী হইয়া ঘরে ঢুকিলাম; দ্বারের পাশেই সুইচ ছিল, আলো জ্বালিয়া দেখিলাম ঘরে কেহ নাই। রাস্তার ধারের জানালাটা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাস্তাতেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাই তো! এত রাত্রে ভদ্রলোক কোথায় গেলেন? অকস্মাৎ মনে হইল–হয়তো ডাক্তারের নিকট ঔষধ লইতে গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। ডাক্তারের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এত রাত্রে নিশ্চয় তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন। বন্ধ দরজার সম্মুখে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়ে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় ঘরের ভিতর গলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। অত্যন্ত উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে অশ্বিনীবাবু কথা কহিতেছেন। একবার লোভ হইল, কান পাতিয়া শুনি কি কথা। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম–হয়তো অশ্বিনীবাবু কোনও রোগের কথা বলিতেছেন, আমার শোনা উচিত নয়। পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অতুল পূর্ববৎ মেঝের উপর শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া ঘাড় তুলিয়া বলিল–“কি অশ্বিনীবাবু ঘরে নেই?”

বিস্মিত হইয়া বলিলাম–“না। তুমি জেগে ছিলে?”

“হ্যাঁ। অশ্বিনীবাবু নীচে ডাক্তারের ঘরে আছেন।”

“তুমি জানলে কি করে?”

“কি করে জানলুম, যদি দেখতে চাও, এই বালিশে কান পেতে মাটিতে শোও।”

“কি হে, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?”

“মাথা ঠিক আছে। শুয়েই দেখ না।”

কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া অতুলের মাথার পাশে মাথা রাখিয়া শুইলাম। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ কানে আসিতে লাগিল। তারপর পরিস্কার শুনিতে পাইলাম, অনুকূলবাবু বলিতেছেন–“আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছেন। ওটা আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অমন হয়। আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে উঠে যদি আপনার ঐ বিশ্বাস থাকে, তখন যা হয় করবেন।”

উত্তরে অশ্বিনীবাবু কি বলিলেন, ধরা গেল না। চেয়ার টানার শব্দে বুঝিলাম, দু’জনে উঠিয়া পড়িলেন।

আমি ভূ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম–“ডাক্তারের ঘরটা যে আমাদের ঘরের নীচেই, তা মনে ছিল না। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো? অশ্বিনীবাবুর হয়েছে কি?”

অতুল হাই তুলিয়া বলিল,–“ভগবান জানেন। রাত হল, এবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়া যাক।”

আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম–“তুমি মাটিতে শুয়েছিলে কেন?”

অতুল বলল–"সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হল, তাই শুয়ে পড়লুম। ঘুমও একটু এসেছিল, এমন সময় ওঁদের কথাবার্তায় চটকা ভেঙে গেল।"

সিঁড়িতে অশ্বিনীবাবুর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘড়িতে দেখিলাম, রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। অতুল শুইয়া পড়িয়াছিল, মেসও একেবারে নিশুতি হইয়া গিয়াছি। আমি বিছানায় শুইয়া অশ্বিনীবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে অতুলের ঠেলা খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বেলা সাতটা বাজিয়াছে। অতুল বলিল–"ওহে, ওঠ ওঠ; গতিক ভাল ঠেকছে না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"অশ্বিনীবাবু ঘরের দরজা খুলছেন না। ডাকাডাকিতে সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কি হয়েছে তাঁর?"

"তা বলা যায় না। তুমি এস"–বলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আমিও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অশ্বিনীবাবুর দরজার সম্মুখে সকলেই উপস্থিত আছেন। উৎকণ্ঠিত জল্পনা ও দ্বার ঠেলাঠেলি চলিতেছে। নীচে হইতে অনুকূলবাবুও আসিয়াছেন। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িয়াই চলিল, কারণ, অশ্বিনীবাবু এত বেলা পর্যন্ত কখনও ঘুমান না। তা ছাড়া, যদি ঘুমাইয়া পড়িয়াই থাকেন, তবে এত হাঁকডাকেও জাগিতেছেন না কেন?

অতুল অনুকূলবাবুর নিকটে গিয়া বলিল–"দেখুন, দরজা ভেঙে ফেলা যাক। আমার তো ভাল বোধ হচ্ছে না।"

অনুকূলবাবু বলিলেন–"হ্যাঁ, হ্যাঁ, স আর বল্‌তে! ভদ্রলোক হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন, নইলে জবাব দিচ্ছেন না কেন? আর দেরি নয়, অতুলবাবু, দরজা ভেঙে ফেলুন।"

দেড় ইঞ্চি পুরু কাঠের দরজা, তাহার উপর ইয়েল্‌-লক্‌ লাগানো। কিন্তু অতুল এবং আরও দুই-তিনজন একসঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিতেই বিলাতি তালা ভাঙিয়া ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। তখন মুক্ত দ্বারপথে যে-বস্তুটি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে কাহারও ম্যখে কথা ফুটিল না। স্তম্ভিত হইয়া সকলে দেখিলাম, ঠিক দরজার সম্মুখেই অশ্বিনীবাবু উর্দ্ধমুখ হইয়া পড়িয়া আছেন–তাঁহার গলা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কাটা। মাথা ও ঘাড়ের নীচে পুরু হইয়া রক্ত জমিয়ে যেন একটা লাল মখমলের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আর, তাঁহার প্রক্ষিপ্ত প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটা রক্ত-মাখানো খুর-তখনও যেন জিঘাংসাভরে হাসিতেছে। নিশ্চল জড়পিণ্ডবৎ আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর অতুল ও ডাক্তার একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার বিহ্বলভাবে অশ্বিনীবাবুর বীভৎস মৃতদেহের প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন,–"কি ভয়ানক, শেষ অশ্বিনীবাবু আত্মহত্যা করলেন!"

অতুলের দৃষ্টি কিন্তু মৃতদেহের দিকে ছিল না। তাহার দুই চক্ষু তলোয়ারের ফলার মত ঘরের চারিদিকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে একবার বিছানাটা দেখিল, রাস্তার ধারের খোলা জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তারপর ফিরিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল–"আত্মহত্যা নয়, ডাক্তারবাবু, এ খুন, নৃশংস নরহত্যা। আমি পুলিস ডাকতে চললুম–আপনারা কেউ কোন জিনিস ছোঁবেন না।"

অনুকূলবাবু বলিলেন–"বলেন কি, অতুলবাবু–খুন! কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল–তা ছাড়া ওটা–" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মৃতের হস্তে রক্তাক্ত ক্ষুরটা দেখাইলেন। অতুল

মাথা নাড়িয়া বলিল–"তা হোক্, তবু এ খুন! আপনারা থাকুন–আমি এখনই পুলিস ডেকে আনছি।"–সে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু কপালে হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন–"উঃ, শেষে আমার বাসাতে এই ব্যাপার হল!"

সত্যান্বেষী ০৩

পুলিশের কাছে মেসের চাকর বামুন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সকলেরই এজাহার হইল। যে যাহা জানি, বলিলাম। কিন্তু কাহারও জবানবন্দীতে এমন কিছু প্রকাশ পাইল না যাহাতে অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুর কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। অশ্বিনীবাবু অত্যন্ত নির্বিরোধ লোক ছিলেন, মেস ও অফিস ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ ছিল বলিয়াও জানা গেল না। তিনি প্রতি শনিবারে বাড়ি যাইতেন। দশ-বারো বৎসর এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। কিছুদিন হইতে তিনি বহুমূত্র-রোগে ভুগিতেছিলেন; এইরূপ গোটাকয়েক সাধারণ কথাই প্রকাশ পাইল।

ডাক্তার অনুকূলবাবুও এজাহার দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অশ্বিনীবাবুর মৃত্যু-রহস্য পরিষ্কার না হইয়া যেন আরও জটিল হইয়া উঠিল। তাঁহার জবানবন্দী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি :

"গত বারো বৎসর যাবৎ অশ্বিনীবাবু আমার বাসায় ছিলেন। তাঁর বাড়ি বর্ধমান জেলায় হরিহরপুর গ্রামে। তিনি সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন, একশ' কুড়ি টাকা আন্দাজ মাইনে পেতেন। এত অল্প মাহিনায় পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকার সুবিধা হয় না, তাই তিনি একলা মেসে থাকতেন। এ মেসের প্রায় সকলেই তাই করে থাকেন।

"অশ্বিনীবাবুকে আমি যতদূর জানি, তিনি সরল-প্রকৃতির কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। কখনও কারুর পাওনা ফেলে রাখতেন না, কারুর কাছে এক পয়সা ধার ছিল না। কোন বদখেয়াল কি নেশা ছিল বলেও আমার জানা নেই; মেসের অন্য সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারবেন।

"এই বারো বছরের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিনি। তিনি গত কয়েক মাস থেকে ডায়েবিটিসে ভুগছিলেন, আমারই চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক রোগের কোন লক্ষণ ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। কাল হঠাৎ তাঁর চাল-চলনে একটা অপ্রকিতস্থ ভাব প্রথম লক্ষ্য করলুম।

"কাল বেলা প্রায় পৌঁনে দশটার সময় আমি আমার ডাক্তারখানায় বসেছিলুম। হঠাৎ অশ্বিনীবাবু এসে বললেন–'ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।' একটু আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম; তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল। জিজ্ঞাসা করলুম–'কি কথা?' তিনি এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বললেন–'এখন নয়, আর এক সময়।' বলেই তাড়াতাড়ি অফিসে চলে গেলেন।

'সন্ধ্যার পর আমি, অজিতবাবু আর অতুলবাবু আমার ঘরে বসে গল্প করছিলুম, হঠাৎ অজিতবাবু দেখতে পেলেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীবাবু আমাদের কথা শুনছেন। তাঁকে ডাকতেই তিনি কোন গতিকে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমরা সবাই অবাক্ হয়ে রইলুম, ভাবলুম, কি হল অশ্বিনীবাবুর?

"তারপর রাত্রি দশটার সময় তিনি চোরের মত চুপি চুপি আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মুখ দেখেই বুঝলুম, তাঁর মানসিক অবস্থা প্রতিতস্থ নয়। দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি আবোল-তাবোল নানারকম বলতে লাগলেন। কখনও বলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভীষণ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখেছেন, কখনও বলেন, একটা ভয়ানক গুপ্তরহস্য জানতে পেরেছেন। আমি তাকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তিনি ঝোঁকের মাথায় বলেই চললেন। শেষ আমি তাঁকে এক পুরিয়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে বললুম–'আজ রাত্রে শুয়ে পড়ুন গিয়ে, কাল সকালে আপনার কথা শুনব।' তিনি ওষুধ নিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

"সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা,–তারপর আজ সকালে এই কাণ্ড! তাঁর ভাবগতিক দেখে তাঁর মানসিক প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি যে এই ক্ষণিক উত্তেজনার বশে আত্মঘাতী হবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

অনুকূলবাবু নীরব হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনি মনে করেন, এ আত্মহত্যা?"

অনুকূলবাবু বলিলেন–"তা ছাড়া আর কি হতে পারে? তবে অতুলবাবু বলছিলেন যে, এ আত্মহত্যা নয়–অন্য কিছু। এ বিষয়ে তিনি হয়তো বেশি জানেন, অতএব তিনিই বলতে পারেন।"

দারোগা অতুলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন–"আপনিই না অতুলবাবু? এটা যে আত্মহত্যা নয়, তা মনে করবার কোনও কারণ আছে?"

"আছে। নিজের হাতে মানুষ অমন ভয়ানকভাবে নিজের গলা কাটতে পারে না। আপনি লাস দেখেছেন–ভেবে দেখুন, এ অসম্ভব।"

দারোগা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন–"হত্যাকারী কে, আপনার কোনও সন্দেহ হয় কি?"

"না।"

"হত্যার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন কি?"

অতুল রাস্তার দিকের জানলাটা নির্দেশ করিয়া বলিল–"ঐ জানলাটা হত্যার কারণ।"

দারোগা সচকিত হইয়া বলিলেন–"জানলা হত্যার কারণ? আপনি বলতে যান, হত্যাকারী ঐ জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল?"

"না। হত্যাকারী দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।"

দারোগা মৃদু হাসিয়া বলিলেন–“আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।”

“স্মরণ আছে।”

দারোগা ঈষৎ পরিহাসের স্বরে বলিলেন–“তবে কি অশ্বিনীবাবু আহত হবার পর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন?”

“না, হত্যাকারী অশ্বিনীবাবুকে হত্যা করবার পর বাইরে থেকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।”

“সে কি করে হতে পারে?”

অতুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল–“খুব সহজে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।”

অনুকূলবাবু এতক্ষণ দরজাটার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন–“ঠিক তো! ঠিক তো! দরজা সহজেই বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়, এতক্ষণ আমাদের মাথাতেই ঢোকেনি। দেখেছেন না দরজায় যে ইয়েল লক্‌ লাগানো।”

দারোগা প্রবীণ লোক, তিনি গালে হাত দিয়ে ভাবিতে ভাবিতে লাগিলেন,–“সে ঠিক। কিন্তু একটা জায়গায় খট্‌কা লাগছে। অশ্বিনীবাবু যে রাত্রে দরজা খুলে শুয়েছিলেন তার কি কোন প্রমাণ আছে?”

অতুল বলিল–“না, বরঞ্চ তার উল্টো প্রমাণই আছে। আমি জানি, তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন।”

আমি বললাম–“আমিও জানি। আমি তাঁকে দরজা বন্ধ করতে শুনেছি।”

দারোগা বলিলেন–“তবে? অশ্বিনীবাবু রাত্রে উঠে হত্যাকারীকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এ অনুমানও তো সম্ভব বলে মনে হয় না।”

অতুল বলিল–"না। কিন্তু আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে, অশ্বিনীবাবু গত কয়েকমাস থেকে একটা রোগে ভুগছিলেন।"

"রোগে ভুগছিলেন? ওঃ! ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, অতুলবাবু! ও কথাটা আমার খেয়ালই ছিল না।" দারোগা একটু মুরুব্বীয়ানাভাবে বলিলেন–"আপনি দেখছি বেশ intelligent লোক, পুলিসে ঢুকে পড়ুন না! এ পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু এদিকে ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। যদি সত্যিই এটা হত্যাকাণ্ড হয়, তাহলে হত্যাকারী যে ভয়ানক হুঁশিয়ার লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কারুর উপর আপনাদের সন্দেহ হয়?" বলিয়া উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সকলেই নীরবে মাথা নাড়িলেন। অনুকূলবাবু বলিলেন–"দেখুন, এ পাড়ায় প্রায়ই একটা-দুটো খুন হয়; এ খবর অবশ্য আপনার কাছে নূতন নয়। পরশু দিনই আমাদের বাসার প্রায় সামনে একটা খুন হয়ে গেছে। এই সব দেখে আমার মনে হয় যে, সবগুলো হত্যাই এক সুতোয় গাঁথা,–একটার কিনারা হলেই অন্যটার কিনারা হবে। অবশ্য যদি অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে মেনে নেওয়া হয়!"

দারোগা বলিলেন–"তা হতে পারে। কিন্তু অন্য খুনের কিনারা হবার আশায় বসে থাকলে বোধহয় অনন্তকাল বসেই থাকতে হবে।"

অতুল বলিল–"দারোগাবাবু, যদি এ খুনের কিনারা করতে চান, তাহলে ঐ জানালাটার কথা ভাল করে ভেবে দেখবেন।"

দারোগা ক্লান্তভাবে কহিলেন–"সব কথাই আমাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে, অতুলবাবু। এখন আপনাদের প্রত্যেকের ঘর আমি খানাতল্লাস করতে চাই।"

তারপর উপরে নীচে সব ঘরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাস করা হইল, কিন্তু কোথাও এমন কিছু পাওয়া গেল না যাহার দ্বারা এই মৃত্যু-রহস্যের উপর আলোকপাত হইতে

পারে। অশ্বিনীবাবুর ঘরও যথারীতি অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু দু'একটা অতি সাধারণ পারিবারিক চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ক্ষুরের শূন্য খাপটা বিছানার পাশেই পড়িয়াছিল। তিনি নিজে ক্ষৌরকার্য করিতেন এ কথা আমরা সকলেই জানিতাম, খাপটা চিনিতেও কষ্ট হইল না। অশ্বিনীবাবুর মৃতদেহ পূর্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল, অতঃপর তাঁহার দরজায় তালা লাগাইয়া সীলমোহর করিয়া দারোগা বেলা দেড়টা নাগাদ প্রস্থান করিলেন।

অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে 'তার' পাঠানো হইয়াছিল, বৈকালে তাঁহার পুত্ররা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিস্মিত বিমূঢ় শোকের চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিলাম। আমরা অনাত্মীয় হইলেও অশ্বিনীবাবুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে প্রত্যেকেই গভীরভাবে আহত হইয়াছিলাম। তা ছাড়া নিজেদের প্রাণ লইয়াও কম আশঙ্কা হয় নাই। যেখানে পাশের ঘরে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, সেখানে আমাদের জীবনেরই বা নিশ্চয়তা কি? মলিন সশঙ্ক অবসন্নতার ভিতর দিয়া এই বিপদভারাক্রান্ত দুর্দিন কাটিয়া গেল।

রাত্রিকালে শয়নের পূর্বে ডাক্তারের ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি স্তব্ধগম্ভীরমুখে বসিয়া আছেন। এই এক দিনের ঘটনায় তাঁহার শান্ত নিশ্চিহ্ন মুখের উপর কালো কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলাম–"বাসার সকলেই তো মেস ছেড়ে চলে যাবার জোগাড় করছেন।"

ম্লান হাসিয়া অনুকূলবাবু বলিলেন–"তাঁদের তো দোষ দেওয়া যায় না, অজিতবাবু! এ রকম ব্যাপার যেখানে ঘটে, সেখানে কে থাকতে চায় বলুন!–কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না–একে খুব বলা যেতে পারে কি করে? আর যদি খুনই হয়, তাহলে মেসের বাইরের লোকের দ্বারা তো খুন বলা যেতে পারে কি করে? আর যদি

খুনই হয়, তাহলে মেসের বাইরের লোকের দ্বারা তো খুব সম্ভব হতে পারে না। প্রথমত, হত্যাকারী উপরে উঠল কি করে? সিঁড়ির দরজা রাত্রিকালে বন্ধ থাকে, এ তো আপনারা সকলে জানেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, লোকটা কোনও কৌশলে উপরে উঠেছিল– কিন্তু সে অশ্বিনীবাবুর ক্ষুর দিয়ে তাঁকে খুন করল কি করে? এ কি কখনও সম্ভব? সুতরাং বাইরের লোকের দ্বারা খুন হয়নি এ কথা নিশ্চিত। তা হলে বাকি থাকেন কারা?–যাঁরা মেসে থাকেন। এঁদের মধ্যে অশ্বিনীবাবুকে খুন করতে পারে, এমন কেউ আছে কি? অবশ্য অতুলবাবু অল্পদিন হল এসেছেন–তাঁর বিষয়ে আমরা কিছু জানি না–"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম–"অতুল–?

ডাক্তারবাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন–"অতুল্বাবু লোকটিকে আপনার কি রকম মনে হয়?"

আমি বলিলাম–"অতুল? না না, এ কখনও সম্ভব নয়। অতুল কি জন্য অশ্বিনীবাবুকে–"

ডাক্তার বলিলেন–"তবেই দেখুন, আপনার মুখ থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, মেসের কেউ এ কাজ করতে পারেন না। তাহলে বাকি থাকে কি?–তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এই কথাটাই কি বাকি থেকে যাচ্ছে না?"

"কিন্তু আত্মহত্যা করবারও তো একটা কারণ থাকা চাই।"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। আপনার মনে আছে–কিছুদিন আগে আমি বলেছিলুম যে এ পাড়ায় একটা কোকেনের গুপ্ত সম্প্রদায় আছে।–এই সম্প্রদায়ের সর্দার কে তা কেউ জানে না।"

"হ্যাঁ–মনে আছে।"

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন–"এখন মনে করুন, অশ্বিনীবাবুই যদি এই সম্প্রদায়ের সর্দার হয়?"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম–"সে কি? তাও কি কখনও সম্ভব?"

ডাক্তার বলিলেন–"অজিতবাবু, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। বরঞ্চ কাল রাত্রে অশ্বিনীবাবু আমাকে যে-সব কথা বলেছিলেন, তাতে এই সন্দেহই ঘনীভূত হয়–খুব সম্ভব তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। অত্যধিক ভয় পেলে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়তে পারে। কে বলতে পারে, হয়তো এই অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকেই আত্মহত্যা করেছেন!–ভেবে দেখুন, এ অনুমান কি সঙ্গত মনে হয় না?"

এই অভিনব থেয়োরি শুনিয়া আমার মাথা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল, আমি বলিলাম–"কি জানি ডাক্তারবাবু, আমি তো কিছুই ধারণা করতে পারছি না। আপনি বরং আপনার সন্দেহের কথা পুলিসকে খুলে বলুন।"

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন–"কাল তাই বলব। এ সমস্যার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।"

সত্যান্বেষী ০৪

দুই তিনটা দিন কোন রকমে কাটিয়া গেল। মনের আকান্ত অশান্তির উপর সি-আই-ডি বিভাগের বিবিধ কর্মচারীর নিরন্তর যাতায়াতে ও সওয়াল-জবাবে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মেসের প্রত্যেকেই পালাই পালাই করিতেছিলেন, কিন্তু আবার পালাইতেপ সাহস হইতেছিল না। কি জানি, তাড়াতাড়ি বাসা ছাড়িলে যদি পুলিস তাঁহাকেই সন্দেহ করিয়া বসে।

বাসারই কোন ব্যক্তির চারিধারে যে সন্দেহের জাল ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে, তাহার ইশারা পাইতেছিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি কে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছিলাম না। মাঝে মাঝে অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিতেছিল–পুলিস আমাকেই সন্দেহ করে না তো?

সেদিন সকালে অতুল ও আমি ডাক্তারের ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলাম। একটা মাঝারি গোছের প্যাকিং কেস্-এ ডাক্তারের ঔষধ আসিয়াছিল, তিনি বাক্স খুলিয়া সেগুলি সযত্নে বাহির করিয়া আলমারিতে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। প্যাকিং কেসের উপর আমেরিকার ছাপ মারা ছিল; ডাক্তারবাবু দেশী ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, দরকার হইলেই আমেরিকা কিম্বা জার্মানী হইতে ঔষধ আনাইয়া লইতেন। প্রায় মাসে মাসে তাঁহার এক বাক্স করিয়া ঔষধ আসিত।

অতুল খবরের কাগজের অর্দ্ধাংশটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল,–"ডাক্তারবাবু, আপনি বিদেশ থেকে ওষুধ আনান কেন? দেশী ওষুধ কি ভাল হয় না?"

অতুল একটা বড় সুগার-অফ-মিল্কের শিশি তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে লেখা বিখ্যাত বিক্রেতাদের নাম দেখিয়া বলিল,–"এরিক্ এণ্ড হ্যাভেল্। এরাই বুঝি সবচেয়ে ভাল ওষুধ তৈরী করে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, হোমিওপ্যাথিতে সত্যি সত্যি রো সারে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। এক ফোঁটা জল খেলে আবার রোগ সারবে কি?"

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন,–"এত লোক যে ওষুধ নিতে আসে, তারা কি ছেলেখেলা করে?"

অতুল বলিল,–"হয়তো রোগ আপনিই সারে, তারা ভাবে ওষুধের গুণে সারল। বিশ্বাসেও অনেক সময় কাজ হয় কি না।"

ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,–"খবরের কাগজে আমাদের বাসার কথা কিছু আসে না কি?"

"আছে" বলিয়া আমি পড়িয়া শুনাইলাম,–"হতভাগ্য অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর হত্যার এখনও কোন কিনারা হয় নাই। পুলিসের সি-আই-ডি বিভাগ এই হত্যা রহস্যের তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু কিছু তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, শীঘ্রই আসামী গ্রেপ্তার হইবে।"

"ছাই হবে। ঐ আশা করা পর্যন্ত।" ডাক্তারবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন,–"এ কি! দারোগাবাবু–"

দারোগা ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে দুইজন কনেস্টবল। ইনি আমাদের সি পূর্ব-পরিচিত দারোগা; কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া একেবারে অতুলের সম্মুখে গিয়া বলিলেন,–"আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। থানায় যেতে হবে। গোলমাল করবেন না, তাতে কোন

ফল হবে না। রামধনী সিং, হ্যাণ্ডকফ লাগাও।” একজন কনেস্টবল ক্ষিপ্ত অভ্যস্ত হস্তে কড়াৎ করিয়া হাতকড়া পরাইয়া দিল।

আমরা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। অতুল বলিয়া উঠিল,–“এ কি!”

দারোগা বলিলেন,–“এই দেখুন ওয়ারেণ্ট। অশ্বিনীকুমার চৌধুরীকে হত্যা করার অপরাধে অতুলচন্দ্র মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হল। আপনারা দু’জনে একে অতুলচন্দ্র মিত্র বলে সনাক্ত করেছেন?”

নিঃশব্দে অভিভূতের মত আমরা ঘাড় নাড়িলাম।

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল,–“শেষ পর্যন্ত আমাকেই ধরলেন। আচ্ছা, চলুন থানায়।–অজিত, কিছু ভেবো না–আমি নির্দোষ।”

একটা ঠিকা গাড়ী ইতিমধ্যে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অতুলকে তাহাতে তুলিয়া পুলিস সদলবলে চলিয়া গেল।

পাংশুমুখে ডাক্তার বলিলেন,–“অতুলবাবুই তাহলে–! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! মানুষের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।”

আমার মুখে কথা বাহির হইল না। অতুল হত্যাকারী! এই কয় দিন তাহার সহিত একত্র বাস করিয়া তাহার প্রতি আমার মনে একটা প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার স্বভাবটি এত মধুর যে, আমার হৃদয় এই অল্পকালমধ্যেই সে জয় করিয়া লইয়াছিল। সেই অতুল খুনী! কল্পনার অতীত বিস্ময়ে ক্ষোভে মর্মপীড়ায় আমি যেন দিগভ্রান্ত হইয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু বলিলেন,–“এই জন্যেই অজ্ঞাত-কুলশীল লোককে আশ্রয় দেওয়া শাস্ত্রে বারণ। কিন্তু তখন কে ভেবেছিল যে লোকটা এতবড় একটা–”

আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। স্নানাহার করিবারও প্রবৃত্তি হইল না। ঘরের ওপাশে অতুলের জিনিসপত্র ছড়ানো রহিয়াছে–সেই দিকে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। অতুলকে যে কতখানি ভালবাসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

অতুল যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে,–সে নির্দোষ। তবে কি পুলিস ভুল করিল! আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। যে রাত্রে অশ্বিনীবাবু হত হন, সে রাত্রির সমস্ত কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। অতুল মেঝেয় বালিশের উপর কান পাতিয়া ডাক্তারের সহিত অশ্বিনীবাবুর কথাবার্তা শুনিতেছিল। কেন শুনিতেছিল? কি উদ্দেশ্যে? তারপর রাত্রি এগারোটার সময় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম–একেবারে সকালে ঘুম ভাঙিল। ইতিমধ্যে অতুল যদি–

কিন্তু অতুল গোড়া হইতেই বলিতেছে, এ খুন–আত্মহত্যা নয়। যে স্বয়ং হত্যাকারী, সে কি এমন কথা বলিয়া নিজের গলায় ফাঁসী পরাইবার চেষ্টা করিবে? কিম্বা, এমনও তো হইতে পারে যে, নিজের উপর হইতে সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই অতুল এ কথা বলিতেছে, যাহাতে পুলিস ভাবে যে, অতুল যখন এত জোর দিয়া বলিতেছে, এ হত্যা, তখন সে কখনই হত্যাকারী নহে।

এইরূপ নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত উৎপীড়িত মন লইয়া আমি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, কখনও উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। এমনই করিয়া দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

বেলা তিনটা বাজিল। হঠাৎ মনে হইল, কোনও উকীলের কাছে গিয়া পরামর্শ লইয়া আসি। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কি করা উচিত কিছুই জানা ছিল না, উকীলও কাহাকেও চিনি না। যাহা হউক, একটা উকীল খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইবে না বুঝিয়া একটা

জামা গলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখি–সম্মুখেই অতুল!

"অ্যাঁ–অতুল!" বলিয়া আমি আনন্দে তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিলাম। সে দোষী কি নির্দোষ, এ আন্দোলন মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল।

রুক্ষ মাথা, শুষ্ক মুখ, অতুল হাসিয়া বলিল,–"হ্যাঁ ভাই, আমি। বড্ড ভুগিয়েছে! অনেক কষ্টে একজন জামীন পাওয়া গেল–তাই ছাড়া পেলুম, নইলে আজ হাজত বাস করতে হত। তুমি চলেছ কোথায়?"

একটু অপ্রতিভভাবে বলিলেন,–"উকীলের বাড়ী।"

অতুল সস্নেহে আমার একটা হাত চাপিয়া দিয়া বলিল,–"আমার জন্যে? তার আর দরকার নেই ভাই। আপাতত কিছু দিনের জন্য ছাড়ান্ পাওয়া গেছে।"

আমি দ্বিধা ঠেলিয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম,–"অতুল,–তুমি–তুমি–"

"আমি কি? অশ্বিনীবাবুকে খুন করেছি কিনা?" অতুল মৃদুকণ্ঠে হাসিল–"সে আলোচনা পরে হবে। এখন কিছু খাওয়া দরকার। মাথাটা ধরেছে দেখছি। যা হোক, স্নান করলেই সেরে যাবে বোধ হয়।"

ডাক্তারবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতুল বলিল,–"অনুকূলবাবু, ঘষা দোয়ানীর মত আবার আমি ফিরে এলুম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে না–bad penny, আমার অবস্থাও প্রায় সেই রকম,–পুলিসেও নিলে না, ফিরিয়ে দিলে।"

ডাক্তার একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন,–"অতুলবাবু, আপনি ফিরে এসেছেন, খুব সুখের বিষয়। আশা করি, পুলিস আপনাকে নির্দোষ বুঝেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার এখানে আর–আপনার–' বুঝতেই তো পারছেন, পাঁচজনকে নিয়ে মেস। এমনিতেই সকলে

পালাই পালাই করছেন, তার উপর যদি আবার–আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই–কিন্তু–"

অতুল বলিল,–"না না, সে কি কথা! আমি এখন দাগী আসামী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনারা বিপদে পড়বেন কেন? বলা তো যায় না, পুলিস হয়তো শেষে আপনাকেও এডিং অ্যাবেটিং চার্জে ফেলবে।–তা, আজই কি চলে যেতে বলেন?"

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অনিচ্ছাভরে বলিলেন,–"না, আজ রাতটা থাকুল; কিন্তু কাল সকালেই–"

অতুল বলিল,–"নিশ্চয়। কাল আর আপনাদের বিব্রত করব না। যেখানে হোক একটা আস্তানা খুঁজে নেব,–শেষ পর্যন্ত ওড়িয়া হোটেল তো আছেই।" বলিয়া হাসিল।

ডাক্তার তখন থানায় কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল ভাসাভাসা জবাব দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার আমাকে বলিলেন,–"অতুলবাবু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন বুঝতে পারছি–কিন্তু উপায় কি বলুন? একে তো মেসের বদনাম হয়ে গেছে–তার উপর যদি পুলিসের গ্রেপ্তারী আসামী রাখি,–সেটা কি নিরাপদ হবে, আপনিই বলুন!"

বাস্তবিক এটুকু সাবধানতা ও স্বার্থপরতার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমি বিরসভাবে ঘাড় নাড়িলাম, বলিলাম–"তা–আপনার মেস, আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।"

আমি গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নানঘরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলাম; ডাক্তার লজ্জিত বিমর্ষমুখে বসিয়া রহিলেন।

স্নানাহার শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছি, এমন সময় ঘনশ্যামবাবু অফিস হইতে ফিরিলেন। সম্মুখে অতুলকে দেখিয়া তিনি যেন ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিলেন, পাংশমুখে বলিলেন,–"অতুলবাবু আপনি–আপনি–?"

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল,–"আমিই বটে ঘনশ্যামবাবু। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?"

ঘনশ্যামবাবু বলিলেন,–"কিন্তু আপনাকে তো পুলিশে–" এই পর্যন্ত বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অতুলের চক্ষু কৌতুকে নাচিয়া উঠিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল,–"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিসে ছুঁলে বোধ হয় আটান্ন। ঘনশ্যামবাবু আমায় দেখে বিশেষ ভয় পেয়েছেন দেখছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অতুল বলিল,–"ওহে দেখ তো, দরজার তালাটা লাগছে না।"

দেখলাম, বিলাতী তালায় কি গোলমাল হইয়াছে। গৃহস্বামীকে খবর দিলাম, তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন,–"বিলাতী তালায় ঐ মুস্কিল; ভাল আছেন তো বেশ আছেন, খারাপ হলে একেবারে এঞ্জিনীয়ার ডাকতে হয়। এর চেয়ে আমাদের দেশী হুড়কো ভালো। যা হোক, কালই মেরামত করিয়ে দেব।" বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন। রাত্রে শয়নের পূর্বে অতুল বলিল,–"অজিত, মাথা ধরাটা ক্রমেই বাড়ছে–কি করি বল তো?"

আমি বলিলাম,–"ডাক্তারের কাছ থেকে এক পুরিয়া ওধুধ নিয়ে খাওনা।"

অতুল বলিল,–"হোমিওপ্যাথি ওষুধ? তাতে সারবে?–আচ্ছা চল, দেখা যাক্–হুমো পাখীর জোর।"

আমি বলিলাম,–"চল, আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না।"

ডাক্তার তখন দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিলেন। অতুল বলিল,–"আপনার ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতে এলুম। বড্ড মাথা ধরেছে-কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন?"

ডাক্তার খুশী হইয়া বলিলেন,–"বিলক্ষণ! পারি বৈ কি! পিত্তি পড়ে মাথা ধরেছে–বসুন, এখনি ওষুধ দিচ্ছি।" বলিয়া আলমারি হইতে নূতন ঔষুধ পুরিয়া করিয়া আনিয়া

দিলেন,–"যান, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে–কাল সকালে আর কিছু থাকবে না।–অজিতবাবু, আপনার চেহারাটাও ভাল ঠেকছে না–উত্তেজনার পর অবসাদ বোধ হচ্ছে–না? শরীর ঢিস-ঢিস্ করছে? বুঝেছি, আপনিও এক দাগ নিন–শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

ঔষধ লইয়া বাহির হইতেছি, অতুল বলিল,–"ডাক্তারবাবু, ব্যোমকেশ বক্সী বলে কাউকে চেনেন?"

ডাক্তার ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন,–"না, কে তিনি?"

অতুল বলিল,–"জানি না। আজ থানায় তার নাম শুনলুম। তিনি না কি এই হত্যার তদন্ত করছেন।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন,–"না আমি তাঁকে চিনি না।"

উপরে নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমি বলিলাম,–"অতুল, এবার সব কথা আমায় বল।"

"কি বল্‌ব?"

"তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। কিন্তু সে হবে না, সব কথা খুলে বলতে হবে।"

অতুল একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,–"আচ্ছা, বলছি। এস, আমার বিছানায় বস। তোমার কাছে যে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না, তা বুঝেছিলুম।"

আমি তাহার বিছানায় গিয়া বসিলাম, সে-ও দরজা ভেজাইয়া দিয়া আমার পাশে বসিল। ঔষধের পুরিয়াটা তখনও আমার হাতেই ছিল, ভাবছিলাম সেটা খাইয়া নিশ্চিন্তমনে গল্প শুনিব। মোড়ক খুলিয়া ঔষধ মুখে দিতে যাইতেছি, অতুল আমার হাতটা ধরিয়া বলিল,–"এখন থাক, আমার গল্পটা শুনে নিয়ে তারপর খেয়ো।"

সুইচ তুলিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া অতুল আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহার গল্প বলিতে লাগিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া চলিলাম। বিস্ময়ে আতঙ্কে মাঝে মাঝে গায়ে গাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

পনের মিনিট পরে সংক্ষেপে গল্প সমাপ্ত করিয়া অতুল বলিল,–"আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল সব খুলে বল্‌ব।" রেডিয়ম অঙ্কিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল,–"এখনও সময় আছে। রাত্রি দু'টোর আগে কিছু ঘটবে না, তুমি বরঞ্চ ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নাও, ঠিক সময়ে আমি তোমাকে তুলে দেব।"

সত্যান্বেষী ০৫

রাত্রি তখন বোধ করি দেড়টা হইবে। অন্ধকারে চোখ মেলিয়া বিছানায় শুইয়াছিলাম। শ্রবণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলে যে, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসের সঙ্গে বিছানার উপর দেহের উত্থান-পতনের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পারিতেছিলাম। অতুল যে জিনিসটা দিয়াছিল, সেটি দৃঢ়মুষ্টিতে ডান হাতে ধরিয়াছিলাম।

হঠাৎ অন্ধকারে কোনো শব্দ শুনিলাম না কিন্তু অতুল আমাকে স্পর্শ করিয়া গেল। ইশারাটা আগে হইতেই স্থির করা ছিল, আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির মত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তারপর কখন দরজা খুলিল, জানিতে পারিলাম না; সহসা অতুলের বিছানার উপর ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিয়া উঠিল। লোহার ডাণ্ডা হস্তে আমি তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, একহাতে রিভলবার, অন্য হাতে আলোর সুইচ ধরিয়া অতুল এবং তাহারই শয্যার পাশে হাঁটু গাড়িয়ে বসিয়া, মরণাহত বাঘ যেমন করিয়া শিকারীর দিকে ফিরিয়া তাকায়, তেমনি বিস্ফোরিত নেত্রে চাহিয়া–ডাক্তার অনুকূলবাবু!

অতুল বলিল,–"বড়ই দুঃখের বিষয় ডাক্তারবাবু, আপনার মত পাকা লোক শেষকালে পাশবালিশ খুন করলে!–ব্যাস্! নড়বেন না! ছুরি ফেলে দিন। হ্যাঁ, নড়ছেন কি গুলি করেছি। অজিত, রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দাও তো–বাইরেই পুলিস আছে।–খবরদার–"

ডাক্তার বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দরজা দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতুলের বজ্রমুষ্টি তাহার চোয়ালে হাতুড়ির মত লাগিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল।

মাটিতে উঠিয়া বসিয়া ডাক্তার বলিল,–"বেশ, হার মানলুম। কিন্তু আমার অপরাধ কি শুনি!"

"অপরাধ কি একটা, ডাক্তার, যে মুখে মুখে বলব। তার প্রকাণ্ড ফিরিস্তি পুলিস অফিসে তৈরী হয়েছে–ক্রমে প্রকাশ পাবে। আপাতত–"

চার পাঁচজন কনেস্টবল সঙ্গে করিয়া দারোগা ও ইন্‌সপেক্টর প্রবেশ করিল।

অতুল বলিল,–"আপাতত, ব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষীকে আপনি খুন করবার চেষ্টা করেছেন, এই অপরাধে পুলিসে সোপর্দ করছি। ইন্‌সপেক্টরবাবু, ইনিই আসামী।"

ইন্‌সপেক্টর নিঃশব্দে ডাক্তারের হাতে হাতকড়া লাগাইলেন। ডাক্তার বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,–"এ ষড়যন্ত্র! পুলিস আর ঐ ব্যোমকেশ বক্সী মিলে আমাকে মিথ্যে মোকদ্দমায় ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। দেশে আইন আদালত আছে,–আমারও টাকার অভাব নেই।"

ব্যোমকেশ বলিল,–"তা তো নেই-ই। এত কোকেন বিক্রীর টাকা যাবে কোথায়!"

বিকৃত মুখে ডাক্তার বলিল,–"আমি কোকেন বিক্রী করি তার কোনও প্রমাণ আছে?"

"আছে বৈ কি ডাক্তার! তোমার সুগার-অফ-মিল্কের শিশিতেই তার প্রমাণ আছে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেমন হয়, ডাক্তার মুহূর্তমধ্যে তেমনই কুঁকড়াইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষু দু'টা ব্যোমকেশের উপর শক্তিহীন ক্রোধে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার মনে হইল, এ যেন আমার সেই সাদাসিধা নির্বিরোধ অনুকূলবাবু নহে, একটা দুর্দান্ত নরঘাতক গুণ্ডা ভদ্রতার খোসল ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহারই সহিত এতদিন পরম বন্ধুভাবে কাল কাটাইয়াছি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,–"কি ওষুধ আমাদের দু'জনকে দিয়েছিলে ঠিক বল দেখি ডাক্তার? মর্ফিয়ার গুঁড়ো–না? বল্‌বে না? বেশ, বোলো না,–কেমিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়োবেই।" একটা চুরুট ধরাইয়া বিছানায় আরাম করিয়া বসিয়া বলিল,–"দারোগাবাবু, এবার আমার এত্তালা লিখুন।"

ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হইলে পর ডাক্তারের ঘর খানাতল্লাস করিয়া দু'টি বড় বড় বোতলে কোকেন বাহির হইল। ডাক্তার সেই যে চুপ করিয়াছিল, আর বাঙ্‌ নিষ্পত্তি করে নাই। অতঃপর তাহাকে বমাল সমেত থানায় রওনা করিয়া দিতে ভোর হইয়া গেল। তাহাদের চালান করিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,–"এখানে তো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। চল আমার বাসায়–সেখানে গিয়া চা খাওয়া যাবে।"

হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ির তেতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে পিতলের ফলকে লেখা আছে

****

*

*

* শ্রীব্যোমকেশ বক্সী *

* সত্যান্বেষী *

*

*

****

ব্যোমকেশ বলিল,–"স্বাগতম! মহাশয় দীনের কুটীরে পদার্পণ করুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,–"সত্যান্বেষীটা কি?"

"ওটা আমার পরিচয়। ডিটেক্‌টিভ কথাটা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি–সত্যান্বেষী। ঠিক হয়নি?"

সমস্ত তেতলাটা ব্যোমকেশের–গুটি চার-পাঁচ ঘর আছে; বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিলাম,–"একলাই থাক বুঝি?"

"হ্যাঁ। সঙ্গী কেবল ভৃত্য পুঁটিরাম।"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,–"দিব্যি বাসাটি। কত দিন এখানে আছ?"

"প্রায় বছরখানেক,–মাঝে কেবল কয়েক দিনের জন্যে তোমাদের বাসায় স্থান পরিবর্তন করেছিলুম।"

ভৃত্য পুঁটিরাম তাড়াতাড়ি স্টোভ্ জ্বালিয়া চা তৈয়ার করিয়া আনিল। গরম পেয়ালায় চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,–"আঃ! তোমাদের মেসে ছদ্মবেশে ক'দিন মন্দ কাটল না। ডাক্তার কিন্তু শেষের দিকে ধরে ফেলেছিল।–দোষ অবশ্য আমারই!"

"কি রকম?"

"পুলিসের কাছে জানলার কথাটা বলেই ধরা পড়ে গেলুম–বুঝতে পারছ না? ঐ জানলা দিয়েই অশ্বিনীবাবু–"

"না না, গোড়া থেকে বল।"

চায়ে আর এক চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,–"আচ্ছা, তাই বলছি। কতক তো কাল রাত্রেই শুনেছ–বাকিটা শোন। তোমাদের পাড়ায় যে মাসের পর মাস ক্রমাগত খুন হয়ে চলছিল, তা দেখে পুলিসের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। এক দিকে বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট, অন্যদিকে খবরের কাগজওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে দিয়ে

আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই রকম যখন অবস্থা, তখন আমি গিয়ে পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম, বললুম–'আমি একজন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ, আমার বিশ্বাস আমি এই সব খুনের কিনারা করতে পারব।' অনেক কথাবার্তার পর কমিশনার সাহেব আমাকে অনুমতি দিলেন; শর্ত হল, তিনি আর আমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানবে না।

"তারপর তোমাদের বাসায় গিয়ে জুটলুম। কোনও অনুসন্ধান চালাতে গেলে অকুস্থানের কাছেই base of operations থাকা দরকার, তাই তোমাদের মেসটা বেছে নিয়েছিলুম। তখন কে জান্‌ত যেম বিপক্ষ দলেরও base of operations ঐ একই জায়গায়!

"ডাক্তারকে গোড়া থেকেই বড্ড বেশী ভালমানুষ বলে মনে হয়ছিল এবং কোকেনের ব্যবসা চালাতে গেলে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সেজে বসা যে খুব সুবিধাজনক, সে-কথাও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। কিন্তু ডাক্তারই যে নাটের গুরু, এ সন্দেহ তখনও হয়নি।

"ডাক্তারকে প্রথম সন্দেহ হল অশ্বিনীকুমার মারা যাবার আগের দিন। মনে আছে বোধহয়, সেদিন রাস্তার উপর একজন ভাটিয়ার লাস পাওয়া গিয়েছিল। ডাক্তার যখন শুনলে যে, তার ট্যাঁকের গেঁজে থেকে এক হাজার টাকার নোট বেরিয়েছে, তখন তার মুখে মুহূর্তে জন্য এমন একটা ব্যর্থ লোভের ছবি ফুটে উঠল যে, তা দেখেই আমার সমস্ত সন্দেহ ডাক্তারের ওপর গিয়ে পড়ল।

"তারপর সন্ধ্যাবেলায় অশ্বিনীবাবুর আড়ি পেতে কথা শোনার ঘটনা। আসলে অশ্বিনীবাবু আমাদের কথা শুনতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে। কিন্তু আমরা রয়েছি দেখে তাড়াতাড়ি যা হয় একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে চলে গেলেন।

"অশ্বিনীবাবুর ব্যবহারে আমার মনে আবার ধোঁকা লাগল, মনে হল হয়তো তিনিই আসল আসামী। রাত্রিতে মেঝেয় কান পেতে যা শুনলুম, তাতেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখেছেন। তারপর সে-রাত্রে যখন তিনি খুন হলেন, তখন আর কোনও কথাই বুঝতে বাকি রইল না। ডাক্তার যখন সেই ভাটিয়াটাকেই রাস্তার ওপর খুন করে, দৈবক্রমে অশ্বিনীবাবু নিজের জানলা থেকে সে দৃশ্য দেখে ফেলেছিলেন। আর সেই কথাই তিনি গোপনে ডাক্তারকে বলতে গিয়েছিলেন।

"এখন ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারছ? ডাক্তার কোকেনের ব্যবসা করত, কিন্তু কাউকে জানতে দিত না যে, সে এই কাজের সর্দার! যদি কেউ দৈবাৎ জানতে পেরে যেত, তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করত। এইভাবে সে এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছে।

"ঐ ভাটিয়াটা সম্ভবতঃ ডাক্তারের দালাল ছিল, হয়তো তারই মারফত বাজারে কোকেন সরবরাহ হত। এটা আমার অনুমান, ঠিক না হতেও পারে। সে-দিন রাত্রে সে ডাক্তারের কাছে এসেছিল, কোনও কারণে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। হয়তো লোকটা ডাক্তারকে blackmail করবার চেষ্টা করে–পুলিসের ভয় দেখায়। তার পরেই–যেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, অমনই ডাক্তারও পিছন পিছন গিয়ে তাকে শেষ করে দেয়।

"অশ্বিনীবাবু নিজের জানলা থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেলেন এবং ঘোর নির্বুদ্ধিতার বশে সে-কথা ডাক্তারকেই বলতে গেলেন।

"তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল, জানি না। তিনি ডাক্তারের কাছে উপকৃত ছিলেন, তাই হয়তো তাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন। ফল হল কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ডাক্তারের চোখে তাঁর আর বেঁচে থাকবার অধিকার রইল না। সেই রাত্রেই কোনও সময় যখন তিনি ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করলেন, অমনই সাক্ষাৎ যম তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাক্তার গোড়ায় সন্দেহ করেছিল কি না বলতে পারি না, কিন্তু যখন আমি পুলিসকে বললুম যে, ঐ জানলাটাই অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর কারণ, তখন সে বুঝলে আমি কিছু-কিছু আন্দাজ করেছি, সুতরাং আমারও ইহলোক ত্যাগ করবার খাঁটি অধিকার জন্মালো। কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার জন্য আমি একেবারে ব্যগ্র ছিলুম না। তাই অত্যন্ত সবধানে দিন কাটাতে লাগলুম।

"তারপর পুলিস এক মস্ত বোকামি করে বস্‌ল, আমাকে গ্রেপ্তার করলে। যা হোক, কমিশনার সাহেব এসে আমাকে খালাস করলেন, আমি আবার মেসে ফিরে এলুম। ডাক্তার তখন স্থির বুঝলে যে, আমি গোয়েন্দা;–কিন্তু সে ভাব গোপন করে আমাকে রাত্রির জন্যে মেসে থাকতে দিয়ে ভারি উদরতা দেখিয়ে দিলে। উদারতার আড়ালে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল–কোনও রকমে আমাকে খুন করা। কারণ, তার বিষয়ে আমি যত কথা জানতুম, এত আর কেউ জানত না।

"ডাক্তারের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত কিন্তু সত্যিকারের কোনও প্রমাণ ছিল না। অবশ্য তার ঘর খানাতল্লাসী করে কোকেন বার করে তাকে জেলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সে যে একটা নিষ্ঠুর খুনী, এ কথা কোনও আদালতে প্রমাণ হত না। তাই আমিও তাকে প্রলোভন দেখাতে শুরু করলুম। দরজার তালার পেরেক ফেলে দিয়ে আমিই সেটাকে খারাপ করে দিলুম। ডাক্তার খবর পেয়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল–আমরা রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুতে পারব না।

"তারপর আমরা যখন ওষুধ নিতে গেলুম, তখন সে সাক্ষাৎ স্বর্গ হাতে পেলে। আমাদের দু'জনকে দু' পুরিয়া গুঁড়ো মর্ফিয়া দিয়ে ভাবলে, আমরা তাই খেয়ে এমন ঘুমই ঘুমুব যে, সে নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হলেও জানতে পারব না।

"তার পরেই ব্যাঘ্র এসে ফাঁদে পা দিলেন। আর কি?"

সত্যান্বেষী ০৬

আমি বলিলাম,–"এখন উঠলুম ভাই। তুমি বোধ হয় উপস্থিত ওদিকে যাচ্ছ না?"

"না। তুমি কি বাসায় যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বাঃ! কেন আবার! বাসায় যেতে হবে না?"

"আমি বলছিলুম কি, ও বাসা তো তোমাকে ছাড়তেই হবে, তা আমার এখানে এলে হত না? এ বাসাটা নেহাৎ মন্দ নয়।"

আমি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম,–"প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি?"

ব্যোমকেশ আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,–"না ভাই, প্রতিদান নয়। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে এক জায়গায় না থাকলে আর মন টিকবে না। এই ক'দিনেই কেমন একটা ব-অভ্যাস জন্মে গেছে।"

"সত্যি বল্‌ছ?"

"সত্যি বল্‌ছি।"

"তবে তুমি থাকো, আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।"

ব্যোমকেশ প্রফুল্লমুখে বলিল,–"সেই সঙ্গে আমার জিনিসগুলো আনতে ভুলো না যেন।"

(সমাপ্ত)